আফসার আমেদের কথাসাহিত্য : সময় ও সমাজের অভিঘাত

(নির্বাচিত উপন্যাস ও ছোটোগল্প অবলম্বনে)

"AFSAR AMEDER KATHASAHITYA : SAMAY O SAMAJER ABHIGHAT

(NIRBACHITA UPANYAS O CHHOTOGALPA ABALAMBANE)"

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের পি.এইচ.ডি. (বাংলা) সম্মাননা প্রাপ্তির জন্য

প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক

অর্পিতা মণ্ডল

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোস্তাক আহমেদ

বাংলা বিভাগ

মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা, ভারত

২০২৩

উপসংহার

উপসংহার

গবেষণার বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রারম্ভে দানা বাঁধে নানান চিন্তাভাবনা। বাংলা সাহিত্যে, বিশেষত কথাসাহিত্য নিয়ে গবেষণার জন্য বর্তমানে অপরিমিত বিষয় প্রাচুর্য। কিন্তু ঈপ্সিতকে বেছে নিয়ে পরিপূর্ণতা দানে ক্রম অগ্রসর হওয়া সহজ ব্যাপার নয়। মহাবিদ্যালয়ে পাঠরতকালে যে ভালোলাগাবোধের অঙ্কুরোদ্গম ঘটে, তাকেই বোধিবৃক্ষের রূপ দিতে মন বদ্ধপরিকর হয়। বহু বিতর্ক, ভালোলাগা-মন্দলাগার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মনকে একীভূত করে দৃঢ়তাদান সহজ ব্যাপার নয়। তবুও একসময় সিদ্ধান্তে উপনীত হতেই হয়। একবিংশ শতকে দাঁড়িয়ে সদ্য ফেলে আসা বিশ শতকের শেষের দিকের কোনো কিছু আঁকড়ে ধরতে চাওয়া বেশ সাহসিকতার পরিচয়বাহী। হয়তো এটাও সত্যি যে, কিছুটা দূর থেকে অর্থাৎ সময়ের ব্যবধানে পর্যবেক্ষণ না করলে সবটুকু দেখা যায় না, পরিপূর্ণ চেনা যায় না। আবার, কাছ থেকে দেখায় পুরোটাই যে ধোঁয়াশাচ্ছন্ন থাকবে, সেটাও অভিপ্রেত নয়। বিতর্ক সাহিত্যের প্রতিটি সোপানের অন্তঃরঙ্গ সহচর। সে ফাঁদে পা না দিয়ে বর্ণনা ও ব্যাখ্যামূলক আলোচনায় নিয়োজিত থাকাই অভিপ্রেত।

পুরোনো ও নতুনের মেলবন্ধন মানুষকে পরিপূর্ণতা দান করে। আদিম ও অর্বাচীনের গাঁটছড়ার মতোই গ্রাম ও শহর তেমনি পরস্পরের পরিপূরক। শহর তার চাকচিক্যের মোহজালে গ্রামীণ উন্মুক্ত প্রকৃতি ও পরিবেশকে অজগরের মতো ক্রমশ গ্রাস করে চলেছে। সময় তার জলজ্যান্ত সাক্ষী। সময়ের হাত ধরে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনশীলতা পুরোনোকে আঁকড়ে না থেকে অর্বাচীনের প্রতি মানুষকে প্রবুদ্ধ করে। সময়কে সঙ্গী করে গ্রামীণ

পরিবেশের অদলবদলকে চিহ্নিতকরণে প্রয়াসী, একজন সুনির্দিষ্ট লেখককে মধ্যবিন্দু করে তাই গবেষণা করার সংকল্প, চেনার মধ্যেই চলে অচেনাকে অন্বেষণের উদ্যোগ, আয়োজন।

গ্রামীণ পরিবেশে শৈশব, কৈশোর অতিক্রম করে বেড়ে ওঠার কারণে সেই গ্রাম্য যাপনচিত্রের প্রতি দুর্বলতা এবং লেখকের গ্রাম-বাংলার পরিচিত কিন্তু কিছুটা তিক্ত পরিবেশের ছবি স্পষ্টকরণে মুনশিয়ানা তাঁর প্রতি আরও বেশি আগ্রহী করে তোলে। ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের ৪ আগস্ট তাঁর মৃত্যু বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে বৃহৎ ক্ষতি হিসাবে চিহ্নিত হয়। শোকাহত মন, পূর্বের সমস্ত বিতর্ক, বিভ্রান্তি, দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে এই নামটিকে নির্বাচনে সুবিধা করে দেয়। আফসোস থেকে যায়, জীবিত লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সুযোগ হারানোর। তাঁর বিভিন্ন সাক্ষাৎকার পড়ি, আর মনে কাঁটার মতো সেকথা বিদ্ধ হয়।

'সাহিত্য' হল চিরন্তন সত্যের অনুসন্ধান। তাই প্রকৃত সাহিত্য নির্দিষ্ট যুগে রচিত হলেও তা যুগোত্তীর্ণ হয়ে ওঠে। আর 'সমাজ' হল সাহিত্যের প্রকৃত আধার। বাস্তবিক 'সমাজ' গড়ে ওঠে একত্রে বসবাসকারী পরস্পর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী, সম্প্রদায়, সংগঠন, সমিতি প্রভৃতির সম্মিলিত সহাবস্থানের সমষ্টিকৃত অবস্থানকে হাতিয়ার করে। সমাজে লিখিত কিংবা অলিখিত কিছু নিয়ম-কানুন তৈরি করা হয়। সমাজভুক্ত মানবগোষ্ঠী সেই নিয়মবিধি মেনে চলতে একরকম বাধ্য। এভাবেই 'সমাজ' শব্দটি ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য ও পরিবেশ নিয়ে উপস্থিত হয়। আসলে সমাজের বহুরূপতা অমৃতময় বিষকুম্ভ পান করায়। মানবজাতিও সমাজকে আশ্রয় করেই বেঁচে থাকার রসদ জোগাড় করে। সমাজ ছাড়া ভ্রাম্যমান যাযাবর জীবনযাপন মানুষকে দিশাহীন করে তোলে। তাই সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে

বহমান সময়কে সাক্ষী রেখেই তার বেঁচে থাকা। ছোটো ছোটো আবেগ-অনুভূতির ঘেরাটোপকে আলিঙ্গন করে সামাজিক জীব হিসাবে নিজেকে স্বীকৃতি দান, প্রতিষ্ঠিত করার আপ্রাণ ব্যাকুলতা। সমাজহারা মানুষ নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করে— মানসিক অবসাদের অবসন্নতার শিকারে পরিণত হয়। সেক্ষেত্রে সুস্থ, স্বাভাবিকভাবে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে মানবজাতির সমাজ নামক অলিখিত প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা বেশ জরুরি। তাছাড়া, সামাজিক জীব হিসাবে বেঁচে থাকার সহজাত প্রবৃত্তিও মানুষের অস্তিত্ব রক্ষায় তৎপর। মানুষের মনোগত সংকীর্ণতামুক্তি— আত্ম-উন্মোচনের পথ তথা সর্বাঙ্গীন বিকাশ অনেকাংশে সমাজের উপর নির্ভরশীল। বাংলা সাহিত্যের প্রামাণিক প্রথম নিদর্শন চর্যাপদের যুগ থেকে সমাজকে ধারণের অপরূপ দৃষ্টান্ত চলে আসছে। হাজার বছর অতিক্রান্তের পরও সেই সময়কে সহচরী করে সমাজের প্রতিফলন বাংলা সাহিত্যে অদ্ভুত ধারায় গতিশীল। সময় ও সমাজ তাই সাহিত্য রূপ কৃষিজমিতে গভীর শিকড় প্রোথিত করে আছে। আফসার আমেদের কথাসাহিত্যেও ধরা আছে সেই জমির উর্বরতার বহু নিদর্শন— সবুজ, টাটকা, সতেজ, প্রাণবন্ত ফসল।

আফসার আমেদের কথাসাহিত্যকে কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন 'পরিবর্তনশীল গ্রাম জীবনের মহাকাব্য' হিসাবে। পশ্চিমবাংলার সমাজের মূল ভিত্তি মূলত গ্রাম। গ্রাম্য সমাজ, সেখানকার চেনা পরিবেশের মধ্যেই অচেনার অন্বেষণ আফসারের আখ্যান-ভুবনের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক। যা আক্ষরিক অর্থে আমাদের জীবনের মাঝ বরাবর দাঁড় করিয়ে দেয়। গ্রামবাংলার পরিচয় আমরা তারাশঙ্কর কিংবা শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে খুঁজে পাই। বিশেষত

শরৎচন্দ্র গ্রামীণ অর্থনৈতিক অস্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের যে চিত্র অঙ্কন করেছেন আফসারের সঙ্গে সেক্ষেত্রে কিছুটা মিল পাওয়া যায়। অন্যদিকে তারাশঙ্কর ব্যক্তি-সমাজের দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে নিজস্ব লেখনীর চমৎকারীত্বে ফুটিয়ে তুলেছেন, আর আফসার ব্যক্তি-সমাজের দ্বন্দ্ব-সংঘাতপূর্ণ চিত্র দেখাননি, দেখিয়েছেন সমাজ আরোপিত অলিখিত নিয়ম কানুনকে ব্যক্তির মস্তকে চাপিয়ে দেওয়ার অদৃশ্য মুগুরকে। যেখানে সমাজের ঘূর্ণাবর্তে চক্রাকারে আবর্তিত রক্তাক্ত, ক্লেদাক্ত একটি চরিত্রকে আফসার তাঁর আখ্যান-বিশ্বের বাসিন্দায় পরিণত করেন। সমাজের নিয়ম-নীতির ভারে যে মুহ্যমান— ঘাড় তুলে সোজা করার ক্ষমতাও অনেকক্ষেত্রে বিলুপ্ত। কোথাও আবার সম্পূর্ণ বিপরীতক্রমে মুক্ত জীবনানন্দের মতো তুরীয়ানন্দে ছুটে চলা। মানব জীবনের অস্তিত্বের জটিল অলিগলির ধারাপাতে রেহানা, রিজি, সেঁজুতি, আবিদ আলি, ফরিদা, জিন্নত বেগম, নিতাই, কমলা, আলো, স্বপনকুমার, আলতা, রুপো, করিম, নাহার, রিজিয়া প্রমুখদের মধ্যেই স্রষ্টাও নির্ভীক হৃদয়ে সংশয় ত্যাগ করে নিজেকে বিলীন করে দেন। এভাবেই নিজের সময়ে বিচরণ করে আফসার গড়ে তোলেন নিজস্ব এক উপাখ্যান পরিমণ্ডল। যেখানে সময় ও সমাজ জীবনের বহুমুখিতা নিয়ে বহমান।

'সময়, সময়ের বৈশিষ্ট্য, পারিপার্শ্বিকতা, মানুষের অবস্থান সৃজনের অভিমুখ রচনা করে। সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় তাই সময়ের গন্ধ। তবে, সচেতন সৃজনকর্মী সময়ের অভিকর্ষকে তার সাধনা ও নৈপুণ্যে পেরিয়ে যান, নতুন এক দিগন্তের সন্ধান দেন।'[১] সাধন চট্টোপাধ্যায়ের গল্প সম্পর্কে পল্লবকান্তি রাজগুরু এমনই অভিমত পোষণ করলেও তা যে সার্বজনীন স্তরে উন্নীত হয় তা বলাবাহুল্য। বাস্তবিক সময়কে অতিক্রম করার দুর্নিবার

আকাঙ্ক্ষা যথার্থ সাহিত্যের মজ্জায় মজ্জায় প্রতিধ্বনি তোলে। তাই সময়ের তালে তাল মিলিয়ে পরিবর্তিত হয় পরিবেশ, পরিস্থিতি, ভাবনা, আঙ্গিক, প্রকাশের ভাষা প্রভৃতি। সেই পরিবর্তনের জলপ্রপাতের স্রোতে স্রষ্টার গতিমুখও পরিবর্তিত হয়। সময় ও সমাজের দ্রুত থেকে দ্রুততর পরিবর্তনের হারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে স্রষ্টার ধারণারও অদলবদল ঘটে। যে সাহিত্য মানুষের মানসিক মুক্তির অবলম্বন হয়ে ওঠে কিংবা তার প্রতিবাদে সামিল হয়ে প্রধান ধ্বজাধারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, সেই সমাজ ও সাহিত্য সম্পূরক-পরিপূরক সম্পর্কে আবেশিত। সমাজকে জানতে, বুঝতে তথা অনুধাবন করতে সাহিত্যের অন্দরে ডুব দেওয়া অনিবার্য হয়ে ওঠে। অন্যদিকে সময়ের সাথে সাহিত্যের রয়েছে হর-গৌরীর একাত্মতা। সংগত কারণেই সময় ও সমাজের পালটে যাওয়া, সাহিত্যে ছাপ ফেলে। বাংলা সাহিত্যও এদিক থেকে ব্যতিক্রমী নয়। যুগের সঙ্গে ভারসাম্য রেখে তার পালটানোর গতিপ্রকৃতি বিচিত্র, বহুমুখী ও রং বেরং-এর আতিশয্যে প্রাঞ্জল।

'আফসার আমেদের কথাসাহিত্য : সময় ও সমাজের অভিঘাত (নির্বাচিত উপন্যাস ও ছোটোগল্প অবলম্বনে)'— এমন বিষয় নির্বাচনের কারণ লেখকের সমগ্র কথাসাহিত্যকে ধরার চেষ্টা। আভিধানিক অর্থে অভিঘাত বলতে সজোরে আঘাত বা শব্দ ইত্যাদির উপর ঝোঁক কিংবা ঝোঁক দেওয়ার চিহ্নকে বোঝায়। আফসারের উপন্যাস ও ছোটোগল্পে সময় ও সমাজ কতটা চিহ্ন রাখতে পেরেছে, তারই অভিজ্ঞান হয়ে উঠেছে এ গবেষণা। আবারও বলতে হয়, আফসারের কেবলমাত্র উপন্যাস বা কিস্‌সাধর্মী রচনাসমূহ কিংবা ছোটোগল্প নিয়ে পৃথকভাবে 'থিসিস' রচনা অসম্ভব ব্যাপার নয়। বিশেষত, তাঁর কিস্‌সাগুলি বাংলা

কথাসাহিত্যের জগতে এক অনন্যতার নজির রাখে। সম্পূর্ণ গদ্য আখ্যানে রচিত কিস্‌সাগুলি বাংলা সাহিত্যে সত্যিই অভিনব সংযোজন। কিন্তু কিস্‌সা ছাড়া আফসারের কথাসাহিত্যে অন্যান্য আরও বহু স্বতন্ত্র দিক বর্তমান। তাই এ গবেষণা আফসার আমেদকে কিস্‌সার মোড়কে বেষ্টিত না রেখে পরিপূর্ণতা দানের এক প্রয়াস বললে অত্যুক্তি হবার কথা নয়।

আফসার আমেদের কথাসাহিত্য নিয়ে আলোচনার প্রথমেই তাঁর ব্যক্তিজীবনের উপর আলোকপাত করেছি। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একদা বলেছিলেন, সাহিত্য পাঠের পূর্বে স্রষ্টার জীবন সম্পর্কে জানা ভীষণ জরুরি। কারণ, তার মধ্যেই সুপ্ত থাকে ভবিষ্যৎ মহীরুহের বীজ। সাহিত্যসম্রাটের মতাদর্শকে সমর্থন করে গবেষণাকর্ম এগিয়ে যায়। আফসারের ব্যক্তিগত যাপনচিত্রের খুঁটিনাটি অন্বেষণে জোর দিই। প্রকৃত পাঠকগোষ্ঠী স্রষ্টার ব্যক্তিজীবনের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা তাঁর সৃষ্টিতে কতটা চিরন্তন হয়ে উঠতে পেরেছে তা জানতে উৎসুক থাকে। তাই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যতই বলুন— 'কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে।'[২] কিংবা 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে ব্যক্ত করুন— 'সফল কাব্যই কবির প্রকৃত জীবনী। সেই জীবনীর বিষয়ীভূত ব্যক্তিটিকে কাব্যরচয়িতার জীবনের সাধারণ ঘটনাবলীর মধ্যে ধরিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা।'[৩] বিশ্বকবির উদ্ধৃত স্বীকারোক্তির পরেও এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের উপরই আস্থা রাখা সমীচীন বলে বোধ জন্মে। সেক্ষেত্রে আফসারের ব্যক্তিজীবনের অবগুণ্ঠিত অন্তরালবর্তী দিকগুলি উন্মোচনে বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন।

'আফসার আমেদ : সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচয়' নামক প্রথম অধ্যায়ে তাঁর সারা জীবনব্যাপী চড়াই-উৎরাই অভিজ্ঞতা, তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা প্রভৃতি সুচারুরূপে অঙ্কিত হয়েছে।

তাঁর জন্ম থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির সময় বয়সের গণ্ডগোল, বেশি বয়সের বোঝা ঘাড়ে চাপিয়েই জীবনযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া, মা আরফা বেগমের বইয়ের প্রতি দুর্বলতা, বাবা সেখ খলিলুর রহমানের সংসার চালাতে অপরিসীম পরিশ্রম, পাঁচ ভাইবোনের দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে বেড়ে ওঠা, ঠাকুরদা সেখ জামালুর রহমান ও ঠাকুমা আয়েশা বেগম অম্লমধুর স্মৃতির ফলকে এখানে বিরাজ করছেন।

দেশভাগ মানব জীবনকে কতরকমভাবে প্রভাবিত করেছে তার নিদর্শন সাহিত্যের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে আছে। স্রষ্টা আফসার আমেদের পরিবারের বেশিরভাগ সদস্যকে পূর্ববঙ্গের ঢেউ টেনে নিয়ে যায়। মা আরফা বেগমের সংকল্পের দৃঢ়তায় তাঁরা বৃহৎ ভারতের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গে রয়ে যান। তাই যারা আফসারকে বাংলাদেশের লেখক ভেবে ভুল করে— তাদের ভাবনাই সেক্ষেত্রে হয়তো সত্যি হয়ে উঠতে পারত। আধুনিক সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত হাওড়া জেলার অন্তর্গত কড়িয়া গ্রামে কেটেছে আফসারের শৈশব-কৈশোরের দারিদ্র্যপীড়িত দিনগুলি। লেখাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেই চালাতে হয় পড়াশোনার খরচখরচা। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠকালে তিনি হয়ে ওঠেন রীতিমত একজন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক। তাঁর লেখালেখির প্রেরণা হিসাবে গ্রামীণ শান্ত প্রকৃতি-পরিবেশ, সেখানকার মানুষের মনোরঞ্জনের রসদ যাত্রাপালা— সর্বোপরি মায়ের বলা স্বপ্নসন্ধানী রূপকথা লেখককে এক অজানা-অচেনা-সবপেয়েছির কল্পরাজ্যে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আফসারের শৈশবাবস্থায় তথা ষাটের দশকের সামাজিক সংকট সমগ্র বাংলার সঙ্গে তাঁদের পরিবারেও দারুণ প্রভাব বিস্তার করে। আফসারের মনকে যা ভীষণরকম নাড়া দেয়।

সাহিত্যচর্চার প্রারম্ভ কবিতা দিয়ে হলেও আফসার গল্প-উপন্যাস লিখতে চেয়েছেন। সেকথা তিনি বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে ভিন্নভাবে প্রকাশও করেছেন। তাঁর সেই অকপট স্বীকারোক্তি তাঁকে বুঝতে অনেক সহজ করে দেয়। পত্রিকা সম্পাদনা, প্রেস চালানো, এন. জি. ওর অধীনে ফুটপাথে ঘুরে ঘুরে তাদের জীবনকে কিছুটা সহজ করে তোলার চেষ্টা প্রভৃতি অভিজ্ঞতাকে পাথেয় করেই আফসারের লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ।

ছাত্রজীবনেই আফসারের লেখক হিসাবে পরিচিতি তাঁকে কখনো-কখনো অপ্রস্তুতে ফেলে। তিনি ভালো ছাত্র একেবারেই ছিলেন না, অমনোযোগী হিসাবেই শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। লেখক তাঁর শিক্ষকমণ্ডলীর প্রতি অপরিমিত শ্রদ্ধা অকুণ্ঠ হৃদয়ে স্বীকার করেছেন। খুব অল্প বয়স থেকেই তিনি দেশে-বিদেশে বিভিন্ন লেখক সম্মেলন, আলোচনা চক্র, সাহিত্য সম্মেলন প্রভৃতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ পান। তাছাড়া, শৈশব থেকেই লেখালেখিকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করে পড়াশোনা চালানো আফসার সাংসারিক পরিমণ্ডলেও সমান দায়িত্ববান। স্ত্রী, দুই ছেলে-মেয়ে ও বাবা-মাকে নিয়ে তাঁদের সুখী পরিবার। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর সুন্দর মনের সাক্ষী থেকেছেন বহুজন।

কোনো কাহিনি অবলম্বনে চলচ্চিত্র তৈরি হলে সে কাহিনি ও তার স্রষ্টার জনপ্রিয়তা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। আফসারের ক্ষেত্রেও তাঁর উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়িত রূপ এক বিরল সৌভাগ্য হিসাবে পরিগণিত হয়। পরিচালক বিখ্যাত হলে অন্যরকম অনুভূতি হওয়া বিচিত্র নয়। সারাজীবনব্যাপী প্রচুর পুরস্কারে সম্মানিত হলেও পাঠকদের সমালোচনা তথা অনুরাগী পাঠকগোষ্ঠীর মতামত তাঁর কাছে সবচেয়ে বড়ো প্রাপ্তি বলে তিনি মনে করেন।

অল্প বয়সে স্বীকৃতি, দারিদ্র্যতাকে পাশে নিয়েই পথ চলা, সুখী ব্যক্তিজীবন— সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে শারীরিক কুশলতা বেশি প্রয়োজন। কিন্তু আফসার বিভিন্ন ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিলেন। সেই ব্যাধিই তাঁকে অধিক বয়স পর্যন্ত নিঃশ্বাস নিতে দিল না। মাত্র ঊনষাট বছর বয়সে তিনি পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেন। এভাবেই প্রত্যেকটি মানুষকেই চলে যেতে হয়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় বলেছেন— 'জন্মিলে মরিতে হবে, / অমর কে কোথা কবে, / চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন-নদে?'[৪]। কেবল রয়ে যায় তাদের কীর্তিকলাপ, সৃষ্টি, ব্যবহার প্রভৃতির টুকরো টুকরো অম্লমধুর স্মৃতিরেখা।

যে-কোনো শিল্পী তাঁর সমসময়ের কাছে বহুলাংশে ঋণী। সময়ের ঘাত-প্রতিঘাত তাঁকে বড়োই বিচলিত করে। শিল্পীকে অবগত হওয়ার জন্য সমসময়কে জানা, চেনা অবশ্যম্ভাবী। সেই ধারণার বাস্তবায়ন লক্ষে আফসার আমেদের সময়কালের চর্চা এবং সমসময় হিসাবে আশির দশককে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে চিহ্নিত করা। 'সমসময়ের বাংলা কথাসাহিত্য ও আফসার আমেদ' নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ে উদ্ধৃত বিষয়টিই মান্যতা পেয়েছে। আফসারের সময়ের কথাসাহিত্যিকদের চিহ্নিত করে কথাসাহিত্যের ধারাকে অনুধাবন করা। এ বিষয়ে আফসার তাঁর সমকালীন যে সমস্ত লেখক-বন্ধুদের উল্লেখ করেছেন তাঁদের অধিকাংশ আলোচনার সিংহভাগ অধিকার করে আছে।

আশির দশকের বেশিরভাগ কথাকার গল্প-উপন্যাস উভয় ধারায় সব্যসাচীর মতো পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। তাঁদের রচনায় মানবজীবনের অস্তিত্ব সংকট, শতাব্দীর পিঠে শতাব্দী অতিবাহিত হলেও শ্রমজীবী শ্রেণি তথা দিন-আনা দিন-খাওয়া মানুষদের পোড়া

ভাগ্যলেখা, দুঃখ-দুর্দশার ছবি, শোষক-শোষিতের সম্পর্ক, নারী শরীরকে পণ্যরূপে ব্যবহার, মুক্ত বাজার অর্থনীতির রমরমা, জীবন-জীবিকার সংগ্রাম অর্থাৎ রাষ্ট্রিক-সাংস্কৃতিক-সামাজিক প্রেক্ষাপট বড়ো চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলার সমাজজীবনে তেভাগা আন্দোলন, নকশালবাড়ি আন্দোলন প্রভৃতি আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনার মতো চীন-ভারত যুদ্ধের ফলে খাদ্যসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের হাহাকার, কালোবাজারীদের আধিপত্য, ধর্মের অপপ্রয়োগ, প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রভৃতি এমনই টুকরো টুকরো ঘটনা মানবজীবনকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। বিভিন্ন স্রষ্টার সৃজনকর্মে সময়ের স্পন্দনে স্থান করে নেয় সমাজের সাড়া জাগানো ঘটনাবলী। কেবলমাত্র ইতিহাসের পাতায় তথ্য হিসাবে যা আবদ্ধ থাকতে পারত, সেগুলিই শিল্পীবৃন্দের মহিমায় নব নব রূপে উপস্থাপিত হয়। একটি নির্দিষ্ট সময় পরিধির শিল্পীর মধ্যে সেই সময়-ভাবনা ছাড়িয়ে আলাদা নানান সময় দৃষ্টিভঙ্গিগত বিভিন্নতায় উঠে আসতে পারে, আসেও বটে, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

আফসার আমেদ বিশ শতকের আশির দশকের কথাকার হিসাবে চিহ্নিত। তাঁর সময়ের লেখকবৃন্দ শিকড়ের সন্ধানে ছুটে গেছেন গ্রামবাংলার প্রান্তজনদের দুয়ারে দুয়ারে, নিজস্ব জন্মভূমির টানে পৌঁছেছেন প্রত্যন্ত গ্রামে গঞ্জে। এছাড়া, স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যের যে ধারা, সাধারণ মানুষের কথাকার হয়ে ওঠা— এই দশকের লেখকদের মধ্যে সেটা ভীষণমাত্রায় চোখে পড়ে। নিম্নবিত্ত, পথচারী মানুষদের জীবনালেখ্য এই সময়ের কথাসাহিত্যে পরিব্যাপ্ত। শুধু তাই নয়, সাধারণের মনের অন্তর্লোকের অলিগলির অনুসন্ধানে এই দশকের স্রষ্টারা যেন মাস্টারমাইণ্ড। মুক্ত বাণিজ্য নীতির আধিপত্য, যন্ত্রের প্রতি অধিক

নির্ভরতার ক্ষেত্র নির্মাণ, বাংলার নিজস্ব লোকজ সংস্কৃতি, মিথ প্রভৃতি ভিন্নস্বাদের বিষয় প্রাচুর্যে এই দশকের কথাসাহিত্য পরিপূর্ণতা পায়। আফসার তাঁর সময়ের পরিসরকে উপেক্ষা করতে পারেননি। বরং একটু বেশিমাত্রায় সময়ের প্রাত্যহিকতাকে ব্যবহার করেছেন। তাঁর উপন্যাসগুলিতে সামাজিক ঘটনার নিরপেক্ষতা সময়ের সর্বগ্রাসী তাড়নার প্রতিরূপ। আর ছোটোগল্পগুলি তো সচেতন ও মনোযোগী পাঠকদের ক্ষুদ্‌পিপাসা নিবৃত্তিতে সহায়ক। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যতই বলুন— 'ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথা ছোটো ছোটো দুঃখকথা / নিতান্তই সহজ সরল।'[৫]— বাস্তবে তাঁর ছোটোগল্পগুলি অতটা 'সহজ, সরল' নয়। বরং জীবনের জটিল ছাঁচে ঢালাই এক কুশলী কারিগরের বাস্তব প্রতিবেদন।

আফসার মানেই অন্তঃপুরের নারীদের বঞ্চনা, নির্যাতনের সমমর্মী এক মানুষ। সমাজের অবহেলিত, অবজ্ঞাত নারীরা আফসারের মতো পুরুষ লেখক যোদ্ধাদের সমর্থন পেয়ে অন্ধকার গহ্বর থেকে কিছুটা বেরিয়ে আসার শক্তি সঞ্চয় করে। কুপমণ্ডুক সমাজকে বুড়ো আঙুল দেখানোর সাহস অর্জন করে। সমাজের মূল ভিত্তি সূক্ষ্ম সৌন্দর্য চেতনা নয়, স্থূল যৌন ক্ষুধার উপর দণ্ডায়মান— এই মনোভাব তাঁর কথাসাহিত্যে রন্ধ্রে রন্ধ্রে সাপের মতো ফণা তুলে দণ্ডায়মান। যদিও এর জন্য তাঁকে কথাকার আবুল বাশারের মতো জন্মস্থান ছাড়তে হয়নি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, 'ফুলবউ' উপন্যাসে সমাজের উচ্চবিত্তদের বিরোধিতা ও নারীর আবেগ, অনুভূতি তথা ভালো থাকার প্রতি পক্ষাবলম্বন করার জন্য কথাসাহিত্যিক আবুল বাশারকে মুর্শিদাবাদ ছাড়তে বাধ্য করা হয়। আফসারকে তেমন সামাজিক রোষে পড়তে হয়নি। তিনি নারীকে সহনশীল, ধৈর্যশীল, যে-কোনো পরিস্থিতিতে

মানিয়ে নেওয়ার মতো মনের দৃঢ়তা, পরিশ্রমী প্রভৃতি গুণাবলীর অধিকারী করে গড়ে তুলেছেন। যদিও প্রতিবাদী নারীর সংখ্যা তাঁর সৃষ্টিতে বেশ দেখতে পাওয়া যায়। তারা নিজেদের সাধ্যের সাপেক্ষে প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে আফসার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কেবল বাস্তব ঘটনা পরম্পরা বিবৃত করে গেছেন। তাই প্রকৃত সামাজিক পরিস্থিতি সামনে এলেও তা নিয়ে বেশি জলঘোলা হয়নি। তবে, সমাজের অন্ধকার দূরীকরণে আফসারের এ প্রচেষ্টা সর্বান্তকরণে কুর্নিশ দাবি করে।

সময় বড়ো কঠিন এক বাস্তব। বিশ্বজগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়, জীবের অস্তিত্ব সবই নিয়ত বহমান সময়ের অধীন। জীবন-ঘড়ির প্রতিটি ঘন্টা-মিনিট-সেকেণ্ড সময়কে ব্যতীত অচল। বিবর্তনের চলমান ইতিহাস সময়ের পালে জুড়ে দেয় লাগামছাড়া ঘোড়া সদৃশ জীবনের উদাসী হাওয়ার প্রবাহ। মানুষের কর্মযজ্ঞের পালতোলা তরণী ভেসে চলে মহাকালের নিরুদ্দেশের উদ্দেশ্যে। সে পথ অজানা, অচেনা। তার পরিসমাপ্তি বলে কিছু নেই। এগিয়ে চলাই তার অভিপ্রেত। সময়ের সাথে সমাজও নিত্য-নৈমিত্তিক পরিবর্তনের লীলাভূমি। সেই সময় ও সমাজের প্রভাব জীবনের বিস্তৃত ক্যানভাসে কথাকারগণ চমৎকারভাবে সুসজ্জিত করেছেন। উপন্যাসের খোলসে যেগুলি মুড়ে ফেলা বেশ অভিরুচির পরিচয়বাহী। তৃতীয় অধ্যায় 'আফসার আমেদের উপন্যাসে সময় ও সমাজের অভিঘাত' সময়ের সুবিপুল চিত্রপটকে সমাজের ব্যাপকতায় বেঁধে ফেলার প্রয়াস।

একবিংশ শতকের তৃতীয় দশকে দাঁড়িয়ে বিশ শতকের আশির দশকের কথাকার আফসার আমেদের উপন্যাসচর্চা সামান্য হলেও বিতর্কের আমদানি ঘটায়। বিতর্কটা অবশ্য

সেই নিকটবর্তী সময় সংক্রান্ত। তাই উত্তরও গচ্ছিত আছে সময়ের কাছেই। সময় সভ্যতার ইতিহাসে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ স্বয়ংক্রিয় বিষয়। আফসার আমেদের কিস্‌সা উপন্যাসগুলিও রীতিমত নতুন পাঠ্যসামগ্রী। সেইসূত্রে 'কিস্‌সা' শব্দটিকে বিকৃতির হাত থেকে পুনরুদ্ধার করে পঙ্কিলতা মুক্তি ঘটানো আফসার আমেদের উপন্যাস ভুবনের বড়ো সম্পদ। আফসার মোট ছয়টি কিস্‌সা উপন্যাস লিখেছেন। প্রত্যেকটি বিষয় ও স্থান বৈচিত্র্যে নবনির্মিত। তাঁর প্রথম কিস্‌সা উপন্যাস ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে 'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা' নামে প্রকাশিত হয়। এখানে স্বামী ও স্ত্রীর অজান্তে সমাজের রটনায় তালাক প্রাপ্তির ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে। বড়ো অদ্ভুত এই ঘটনা। তার সঙ্গে মিশে আছে কল্পনা, লোকবিশ্বাস, উদ্ভটতত্ব, রীতি, সংস্কার ছাড়াও আধুনিক সমাজের অবদান মুক্ত বাজার অর্থনীতি, নারীর পণ্যায়ন প্রবৃত্তি, বর্তমানের সুবৃহৎ সমস্যা বেকারত্ব, গণতন্ত্রের প্রতিভূ পঞ্চায়তী রাজ, নিরক্ষরতার অভিশাপস্বরূপ ও ধর্মের নামান্তরে মুসলমান সমাজে প্রধানত বহুবিবাহ প্রথার স্বীকৃতি, যৌনতার প্রাধান্য, ধর্মের অপব্যবহার প্রভৃতি সমসাময়িক প্রেক্ষাপটকে লেখক কারুকার্যের মাধ্যমে শিল্পিত করেছেন।

আফসারের দ্বিতীয় কিস্‌সা পরের বছরই অর্থাৎ ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে 'কালো বোরখার বিবি ও কুসুমের গন্ধ এবং চল্লিশজন লোক' নামে প্রকাশিত হয়। এ উপন্যাসের কাহিনিও সমাজের কুৎসিত যৌনতা তথা নারীশরীর লিপ্সার ভয়ংকরতার বার্তাবাহী। সেইসঙ্গে দালালচক্র, সুবিধাভোগী শ্রেণি, পুরুষতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারিতা, ধর্মীয় বাতাবরণের মোড়ক, অর্থনীতির উত্থান-পতনে লোকসমাজে প্রভাব প্রভৃতি বিষয়গুলি সময়কে চিহ্নিত করে দেয়।

'এক আশ্চর্য বশীকরণ কিস্‌সা' নামে আফসারের তৃতীয় কিস্‌সাটি ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও কুসংস্কারের উপর ভর করে এ উপন্যাসটির ভিত্তিপ্রস্তর নির্মিত হয়েছে। শিক্ষার আলোবিহীন সমাজে ভড়ংবাজি করে কিভাবে সর্বসাধারণের বিশ্বাস অর্জন করা যায় তার বাস্তব দলিল হয়ে উঠেছে উপন্যাসটি। নারী তার বুদ্ধি দিয়ে সেকথা অনুধাবন করতে পারলেও সমাজের চাপে চুপ করে থাকাই শ্রেয় বিবেচনা করে। বিংশ শতাব্দীর সমাপ্তিলগ্নের বংশীধ্বনির মাঝে এ কোন্ সমাজকে লেখক প্রতিস্থাপন করলেন, যেখানে নারীরা শুধু অবলা নয়, পুরুষের হাতের ক্রীড়নক।

আফসারের পরবর্তী কিস্‌সা আর বিংশ শতাব্দীর নয়, একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অর্থাৎ ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। গ্রাম নয়, খোদ কলকাতার মেটিয়াবুরুজ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে শোষক-শোষিতের দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় চিত্র লেখক উপস্থাপন করেছেন। শোষিতের প্রতিবাদীসত্তার উন্মীলন এবং অর্থবানদের সমর্থনে গ্যাংস্টারদের সমাজে দাপাদাপির ছবি উঠে এসেছে। মানবিকতা, আবেগ মূল্যহীন, অর্থই সমস্ত ক্ষমতার অধীশ্বর— এমনই এক হৃদয়শূন্য ক্ষয়িষ্ণু সমাজের সামনে লেখক আমাদের দাঁড় করান।

লোভ-লালসা মানবজাতির পতনের প্রধান কারণ। সেই অবনমনকে রোধ করতে সমস্ত ধরনের মোহমুক্তি অবশ্যম্ভাবী। ফকিরি দর্শন সে কথাই ঘোষণা করে। তারা পৃথিবীর সমস্ত পার্থিব লোভ-মোহ ত্যাগ করে সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে অপার্থিব অনুভূতির টানে নিজেকে খুঁজে চলে। এই দর্শন ঐক্য ও সমতার বাণী প্রচার করে। আফসার আমেদের 'হিরে ও ভিখারিনি সুন্দরী রমণী কিস্‌সা' (২০০৭) উপন্যাস সেই ফকিরি দর্শনকে প্রতিষ্ঠা

দেয়। এই দর্শনের ত্যাগী ও মোহমুক্তির শিক্ষা সমাজ ও চরিত্র গঠনে সাহায্য করে। ভোগ ও ত্যাগের তুলনামূলক ব্যাখ্যা এ উপন্যাসকে সার্থকতা দান করে।

ঘোড়া দ্রুততার প্রতীক। জীবনে ছুটে চলার প্রেরণা দেয় এই প্রাণী। কালের বিবর্তনের ধারায় দ্রুততম পরিবহন মাধ্যম হিসাবে একসময় ব্যবহৃত ঘোড়া বিশেষ মর্যাদা বহন করে। ঘোড়সওয়ারও তেমনি মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হয়ে ওঠে। 'এক ঘোড়সওয়ার কিস্‌সা' উপন্যাসে এক ঘোড়সওয়ারের জীবনবৃত্তান্ত ব্যক্ত হয়েছে। সমাজে নারী স্বাধীনতার ক্ষেত্র উন্মোচন ও পুরুষতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে ধাক্কা দেয় এ উপন্যাস।

ছয়টি কিস্‌সা ছাড়া এই অধ্যায়ে আফসারের আরও বারোটি নির্বাচিত উপন্যাস আলোচিত হয়েছে। 'ঘরগেরস্তি' আফসারের প্রথম উপন্যাস (১৯৮২)। জীবনযাপনকে নির্দিষ্ট সীমারেখায় বাঁধার লক্ষে ঘরের অস্তিত্ব পরিকল্পিত হয়। এছাড়া, দু-টি মানুষের ভালোবাসার চিহ্নস্বরূপ শান্তির নিবাস গড়ে ওঠে। এখানে ভালোবাসার অভাব ঘটলেও সামাজিক স্বীকৃত সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখার দায়বদ্ধতা এবং নিজ অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ফল্গুধারার মতো বহমান বিবাহ-পূর্ব প্রেমের গোপন অভিসার। সমাজের কল্যাণে এ অবৈধ সম্পর্ক সময়েরই দান। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সঙ্গে লড়াই করার এ এক গোপন পরিকল্পনা।

আত্মপরিচয় হল নিজের স্বাধিকার রক্ষার লড়াই, আয়নায় নিজের চোখে চোখ রাখার পরীক্ষা। আফসারের 'আত্মপরিচয়' উপন্যাস (১৯৯০) সময়ের গর্ভে ভাস্বর দু-টি বিষয়কে প্রত্যক্ষ তুলে ধরে। শাহবানু মামলার রায় (১৯৮৫) এবং ভাগচাষিদের অধিকার আদায়ের এক আইনি পদক্ষেপ। অপরের খিদমতগিরি নয়, নিজের আশ্রয় নিজেকেই খুঁজে নেওয়া।

'স্বপ্নসম্ভাষ' (১৯৯১) উপন্যাসটি মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' কিংবা দীনবন্ধু মিত্রের 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'-র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। উনিশ আর বিশ শতকের ভাবনায় তফাৎ হল সেক্ষেত্রে স্ত্রী অবর্তমানে, এখানে স্ত্রীর অসুস্থতার ফাঁক গলে অল্পবয়সি যুবতি নারীর প্রতি আকাঙ্ক্ষার জাগরণ। পরিশেষে স্বপ্নভঙ্গ এবং একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে স্ত্রীকে কিশোরী অবস্থার সৌন্দর্য ও সুস্থতা নিয়ে ফিরে পাওয়া। সামাজিক সংস্কার বজায় রেখেই স্বপ্নপূরণ।

'খণ্ডবিখণ্ড' (১৯৯২) উপন্যাসে দেশভাগ পরবর্তী সময়ের এক খণ্ডচিত্র বর্ণিত হয়েছে। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা পাবার পরও বহু পরিবার সমস্ত কিছু হারিয়ে ভারতবর্ষে চলে আসে। এক টুকরো আশার আলো নিয়ে তারা কাজের সন্ধানে বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত হয়। সেরকম বই বাঁধাই তথা দপ্তরিখানার চাকরিও তাদের জীবনে অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। এ উপন্যাস ১৯৮৮ সাল ও তার পরবর্তী কয়েক বছর স্থান করে নেয়। সেইসঙ্গে সমসময়ের আন্তর্জাতিক কিছু ঘটনা উপন্যাসে ছুঁয়ে যায়।

'অন্তঃপুর' (১৯৯৩) উপন্যাসে নারীদের নিজস্ব অধিকারের ক্ষেত্রভূমিতে চড়াই-উৎরাই-এর নানা স্তর থেকে স্তরায়ন, সীমাবদ্ধতা, আনন্দ-বিষাদপূর্ণ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র চাওয়া-পাওয়া, পুরুষতান্ত্রিক দাপটের কাছে প্রচলিত সামাজিক রীতি অনুযায়ী নতিস্বীকার প্রভৃতি ক্ষেত্রগুলি চমৎকার দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে।

পঞ্চায়েতি ক্ষমতার অপব্যবহারের দৃষ্টান্ত পাই 'ধানজ্যোৎস্না' (১৯৯৩) উপন্যাসে। দুই পরিবারের ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের শিকার এক সুখী দম্পতির জীবনে কুড়ুল মেরে বিচ্ছেদ

ঘটানো হয়। যদিও পরবর্তীতে তারা আবার অন্য নর-নারীকে বিবাহ করে এবং উভয়েই খানিকটা হলেও সুখের আস্বাদ পায়। কিন্তু তাদের হৃদয়ে পূর্ববিবাহ, সংসার তথা পূর্ববর্তী সুখী জীবনস্মৃতির দগদগে ক্ষতের মতো দাগ রয়ে যায়।

সমসাময়িক এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনার প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে 'ব্যথা খুঁজে আনা' (১৯৯৪) উপন্যাসে। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংস এবং তার প্রতিক্রিয়ায় সমগ্র ভারতবর্ষের সঙ্গে কলকাতা ও সেই সংলগ্ন অঞ্চলে ব্যাপক প্রভাব লক্ষিত হয়। এ উপন্যাস তার স্বচ্ছ রূপ ও মানবিক মুখের বার্তাবহ।

সমাজ সমর্থিত আইন-কানুন এবং ব্যক্তিগত ভুল সিদ্ধান্তের শিকার হয়ে এক নারীর জীবন কেমনভাবে প্রহসনে পর্যবসিত হয়, সে বিষয়টিই 'দ্বিতীয় বিবি' (১৯৯৭)-তে উঠে এসেছে। বংশানুক্রম বজায় রাখার খিদে অর্থাৎ সন্তান অভীপ্সা যে এক্ষেত্রে কার্যকরী তা বলাবাহুল্য। উপেক্ষিত নারীর অভিমানের কদর সমাজে কয়জন পুরুষ করতে পারে ! এ উপন্যাস যেন তারই এক বৃহৎ পরীক্ষা।

'খোঁজ' (২০০১) উপন্যাসে জীবনের প্রকৃত অর্থ অনুসন্ধানের স্বরলিপি ব্যক্ত হয়েছে— যা সমাজসেবা এবং কর্মের মধ্যে পাওয়া ভালোলাগাবোধ থেকে জন্ম নেয়। চাকুরি জীবন শেষে অবসরকালীন বন্ধুবান্ধবহীন অফুরন্ত সময়ে জীবনের অর্থ উদ্ধারের নেশা এ উপন্যাসের প্রতিলিপি রচনা করে।

আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কার টেলিফোনের ব্যবহারের পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গি 'অশ্রুমঙ্গল' (২০০২) উপন্যাসে ব্যক্ত হয়েছে। বহু দূরের মানুষ একটি তারের মধ্য দিয়ে তাদের

প্রিয়জনদের কণ্ঠস্বর শুনতে পায়, সমাজে আলোড়ন তো বটেই, এ বড়ো বিস্ময়ের ব্যাপার হিসাবে গণ্য হয়।

দুর্ঘটনায় বাবা-মাকে হারানো এক ছেলের বারংবার হারিয়ে যাওয়ার মানসিকতা থেকেই 'সেই নিখোঁজ মানুষটা' (২০১১) উপন্যাসের মূল কাহিনি পরিব্যাপ্ত। সাহসী ছেলেটি উত্তাল নদীবক্ষে ঝাঁপ দিয়ে অন্যের প্রাণ রক্ষার ক্ষমতা রাখে। অপরের উপকারের মধ্যেই সে আনন্দ খুঁজে পায়। তাই সহজেই সকলের ভালোবাসার মানুষে পরিণত হয়। সেইসঙ্গে পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা তথা সরকারি নানা প্রকল্পের যথোপযুক্ত প্রয়োগ মানুষের জীবনকে কতটা সহজতর খাতে বইয়ে দেয়, তার জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত এ উপন্যাস।

একটি সাহসী, শিক্ষিত, বেকার মেয়ের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ও জীবনযুদ্ধে একাকী কঠিন থেকে কঠিনতম লড়াই-এর সম্মুখীন হওয়া এবং অবশেষে বিজয়ী হওয়ার দিশা দিয়ে 'একটি মেয়ে' উপন্যাসের কাহিনিবৃত্ত আবর্তিত হয়।

আফসারের উপন্যাস-বিশ্ব পরিক্রমায় বৈচিত্র্যের জোয়ার দেখা যায়। সেগুলির মধ্যে কিছু উৎকৃষ্ট, কিছু সমালোচিত আখ্যান নিয়ে এই গবেষণা। এমন নির্বাচনের উদ্দেশ্য যাতে পাঠকের আফসার আমেদের পরিপূর্ণতা সম্পর্কে চিনতে, বুঝতে সুবিধা হয়, তারই ক্ষুদ্র প্রয়াস। পারস্য, তুর্কী ও আরবীয় দেশগুলিতে যুদ্ধ, প্রেম, ধর্ম, বীরত্ব প্রভৃতি বিষয়ক জনপ্রিয় লোককাহিনিসমূহ বাংলায় পরিপাটি করে উপস্থাপনের কৃতিত্ব অবশ্যই আফসার আমেদের প্রাপ্য। আফসার যেন মানুষের মন বিশেষজ্ঞ— যিনি মনের ভিতর পর্যন্ত

পাঠগ্রহণে সক্ষম। আসলে আফসার সময়ের চিহ্নকে সমাজ পরিমণ্ডলে আঁকার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর উপন্যাস তাই সমাজের অন্য অনালোকিত দিকের কথা বলে।

ছোটোগল্প রচনায় আফসার আরও সাবলীল। তাঁর এক একটি ছোটোগল্প যেন বারুদের স্ফুলিঙ্গের মতোই জীবন্ত। এখানে তাঁর পঞ্চাশটি নির্বাচিত ছোটোগল্পকে সময় ও সমাজের প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আফসারের ছোটোগল্পসম্ভারও বিষয়ের নিরিখে অনন্য। তাঁর ছোটোগল্পের ঝুলিতে বন্যাকবলিত জনসাধারণের দুর্ভোগের চিত্রের পাশাপাশি তাদের মনের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাও প্রকাশ হয়ে পড়ে। জীবের প্রাথমিক চাহিদা অন্নের জোগাড় করতে অন্যের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করা এক অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের মনের গোপন ইচ্ছারও তিনি খোঁজ রাখেন। সেইসঙ্গে প্রস্তুত করেন মেয়েটির উপর একাধিক পুরুষের লালসা ও যৌন নির্যাতনের বিস্তৃত পরিসরকে। আবার, মহাজনের দ্বারা প্রতারিত হয়ে সর্বস্ব হারিয়ে গ্রামের দরিদ্র মানুষজন রুজি-রোজগারের টানে শহরে ছুটে যায়। পরিস্থিতির চাপে তারা মাসের পর মাস, বছরের পর বছর আর পরিবার-পরিজনদের কাছে ফিরতে পারে না। তাদের অনুপস্থিতিতে সংসারের অন্য সদস্যদের বেঁচে থাকা দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। এছাড়া, শোষক-শোষিতের সম্পর্কের চিরকালীন নিষ্ঠুরতা ছাড়াও নারীর প্রতি সমাজের চাপিয়ে দেওয়া নানা বিধি-ব্যবস্থা, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠ আঁকতেও গল্পকার ভোলেননি।

আর্থিক মানদণ্ডে অসহায় নারী সমাজ ভিন্ন ভিন্ন খাতে শোষণ, নির্যাতন, লাঞ্ছনা, বঞ্চনার শিকার হয়। স্বনির্ভর হতে চাওয়া নারীরাও কেমনভাবে সমাজের পাতা ফাঁদে পড়ে

ডাঙায় ওঠা জিওল মাছের মতো ছটফট করতে থাকে, তার চমৎকার অভিব্যক্তি আফসারের গল্পে ফুটে ওঠে। তিনি নারীদের সহনশীল, ধীর, স্থির, শান্ত প্রভৃতি গুণের অধিকারী হিসাবে অঙ্কন করেছেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীদের শারীরিক-মানসিক প্রভৃতি যত রকম উপায়ে অত্যাচারিত করা সম্ভব, তার ধারাবিবরণী রচনা করেছেন গল্পকার।

মাথার উপর ছাদ জোটে না যাদের, কিন্তু ছাদের তলায় বসবাসের বাসনা তীব্রতর— সেই ফুটপাথের অধিবাসীরা তাঁর লেখনীতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর সৃষ্টিতে 'ভালোবাসা' শব্দটি কোথাও প্রহসনতুল্য, কোথাও আবার সেটি জয়ের বরমাল্য বয়ে আনে— এমনই বিষয়ের বহুরূপতার মাঝেও আঙ্গিকগত দিকে ওপেন এন্ডেড ফর্ম (open ended form)-এর ব্যবহার তাঁর ছোটোগল্পের দুনিয়ায় চমৎকারিত্বের আমদানি ঘটায়। আফসার যেন সাধারণ মানব-জীবনের সুনিপুণ ধারাভাষ্যকার। তাঁর সৃষ্ট অসাধারণ সব ছোটোগল্পগুলি সে কথারই দৃঢ়তা দান করে।

পৃথিবীতে অস্তিত্বসম্পন্ন জড় কিংবা সজীব প্রভৃতি প্রতিটি বস্তু, জীবের মধ্যেই কিছু-না-কিছু পার্থক্য থেকে যায়। আবার, পৃথক পৃথক ব্যক্তিরাও নিজের মৌলিকত্ব বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকে। আফসারের কথাসাহিত্যেও তেমনি স্বতন্ত্রতার পরিসর বর্তমান। সেগুলিকেই একত্রিত করে 'আফসার আমেদের কথাসাহিত্যে স্বতন্ত্রতা' নামক পঞ্চম অধ্যায়ের অবতারণা। এখানে নির্দিষ্ট স্থান, বিষয়, আঙ্গিক, ভাষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে আফসারের কথাসাহিত্যের পৃথক অলিগলি চিহ্নিত করা হয়েছে। সমকালীন লেখকদের প্রতিতুলনায় আফসারের স্বাতন্ত্র্যগুলি নির্ধারণ করে একটি বিস্তৃত আলোচনার পরিসর গড়ে উঠেছে।

আমার সমস্ত প্রচেষ্টা দিয়ে গবেষোণাপত্রটিকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু শেষ বেলাতেও মনে হচ্ছে, আফসার আমেদের উপর সম্পূর্ণ কাজটি করতে পারলাম না। গবেষণা শেষ হল। নির্বাচনের ভিত্তিতে লেখকের উৎকৃষ্ট, সমালোচিত প্রভৃতি মিশ্রিত লেখা গবেষণায় স্থান পেয়েছে। তবে, আর নির্বাচন নয়, তাঁকে নিয়ে চর্চার জন্য পড়ে রইল গোটা জীবন। তবু বিশ্বাস বর্তমান সময় ও সমাজের প্রেক্ষিতে সাহিত্য প্রাঙ্গণে সাম্য, সমতা, সমান্তরালতা বজায় রাখতে পরবর্তীকালের গবেষকদের কাছে গবেষণাকর্মটি গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচিত হবে।

তথ্যসূত্র :

১। বীরেন চন্দ্র (সম্পাঃ), 'বিষয় : বাংলা ছোটগল্প', ১ম প্রকাশ, উত্তরধ্বনি, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ২৩২

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "উৎসর্গ", 'রবীন্দ্র–রচনাবলী' (পঞ্চম খণ্ড), পুনর্মুদ্রণ, বিশ্বভারতী, পৌষ ১৪০২ বঃ, পৃ. ৯৮

৩। শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "আত্মপরিচয়", 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', (একাদশ খণ্ড, প্রবন্ধ), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, আগস্ট, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ১৩৫

৪। ড. ক্ষেত্রগুপ্ত (সম্পাঃ), "বঙ্গভূমির প্রতি", 'মধুসূদন রচনাবলী', ২য় মুদ্রণ, সাহিত্য সংসদ, নভেম্বর ১৯৫৭, পৃ. ১৮৬

৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "বর্ষাযাপন", 'সোনার তরী', পুনর্মুদ্রণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, বৈশাখ ১৪১৯ বঃ, পৃ. ৩৫